চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন ঔপন্যাসিক ও মনোজ বসু

রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা অভিনবত্ব এনেছিলেন। 'কল্লোলগোষ্ঠী' বলতে কল্লোল, কালি কলম, ধূপ-ছায়া, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীকে বোঝায়। এদের মধ্যে প্রধান হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। এছাড়াও ছিলেন জগদীশ গুপ্ত, মণীশ ঘটক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রমুখরা। পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত 'মহানগর', 'সংসার সীমান্তে', 'পুন্নাম', 'স্টোভ' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'রসকলি' (তারাশঙ্কর), 'কয়লাকুঠির দেশ' (শৈলজানন্দ) প্রভৃতি রচনাগুলি। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের সমসাময়িক হলেন মনোজ বসু। চরিত্র ধর্মে তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। সমসাময়িক তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও শৈলজানন্দের সঙ্গে মনোজ বসুর তুলনামূলক আলোচনা করব।

কল্লোল যুগে বর্তমান থাকলেও মনোজ বসু কল্লোলের নাগরিকতা থেকে ছিলেন মুক্ত। সেদিক থেকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। শিল্পমনের সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উভয় সাহিত্যিক শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে জীবিকায় অংশ-গ্রহণ করেছেন। বিভূতিভূষণ ছিলেন বরাবরই শিক্ষক —

> "তিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি বহুদিন আগে ৩৬ টাকা বেতনে কাজ করেছেন, টিউশন করেছেন।"[১]

মনোজ বসুও প্রথম জীবনে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের সম্পর্কে বলেছেন —

> "বি.এ. পাশ করে মাষ্টারি জুটিয়ে নিলাম একটা। ... ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলে ট্যুইশনি ... গেঁথে ফেললাম সাত-আটটা। বিদ্যাদানের অষ্টপ্রহরী মচ্ছব চলল, ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠি এখন।"[২]

বিভূতিভূষণ ও মনোজ বসু উভয়েই চরম দারিদ্র্য ও উঞ্ছবৃত্তির মধ্যেও স্রষ্টার মানসিকতাকে জাগরিত রাখতে পেয়েছেন। জীবিকার মূল্যায়নে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'অনুবর্তন' (১৯৪১) উপন্যাসটি। একদল শিক্ষক, যারা কিশোর বয়স্ক বালকদের সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে

তোলার কাজে নেমেছেন। মনোজ বসুও একই মনন ও মানসিকতায় লিখেছেন 'মানুষ গড়ার কারিগর' ও 'নবীন যাত্রা' উপন্যাস। এই বিষয়ের সাহিত্য রচনায় তারাশঙ্কর ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় থেকেছেন নীরব।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু জীবিকা সূত্রে শহর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেও পল্লী ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা অটুট রেখেছেন উভয়েই। প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতায় প্রবাসী বিরহবোধ করেছেন। চিরচেনা গ্রাম তাঁদের দৃষ্টিপটের সম্মুখে রোমাণ্টিক স্বপ্নের জগৎ রচনা করে। পল্লীর প্রাণলীলার মধ্যদিয়ে উদ্ভুত হয়েছে লেখকদ্বয়ের পল্লীপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রীতি। প্রকৃতি ও মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁদের রচনায়। বিভূতিভূষণ মনে করতেন —

> "জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে আমাদের সামনে গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়। সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে সেই আনন্দের বার্তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"[৩]

পল্লীপ্রাণ মনোজ বসুর পক্ষেও পল্লীবিচ্ছিন্ন হওয়া একেবারেই দুঃসহ। তিনি মনে করেন —

> "আমাদের বড় ক্ষোভ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি বলে। সর্বদাই মনে হয় যে, এখানে আমি প্রবাসী, আমি একজন বহিরাগত।"[৪]

'পথের পাঁচালী (১৯২৯) থেকে 'ইছামতী' (১৩৫০) পর্যন্ত প্রকৃতির প্রসন্নতায় বিভূতিভূষণ শান্ত উদার। এই প্রকৃতি প্রীতি মনোজ বসুর শিল্পী সত্তার ভিত্তিভূমি। মনোজ বসুর 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ', 'প্রেম নয় মিছে কথা', 'ছবি আর ছবি' প্রভৃতি উপন্যাসে এই মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করি। মনোজ বসুর মতো তারাশঙ্করও পল্লীর ভক্ত। গ্রামের বহুবিচিত্র মানুষের প্রতি তারাশঙ্করের কৌতূহল। পরিচিত অপরিচিত মানুষের এক অনাবিষ্কৃত জীবন ও জগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। তারাশঙ্করের সঙ্গে মনোজ বসুর মিল বহিরঙ্গে। আর অন্তরঙ্গের মিল বিভূতিভূষণের সঙ্গে। তারাশঙ্করের রচনায় বীরভূমের রুক্ষতা, আর মনোজ বসুর রচনায় আছে যশোহরের পল্লীর শ্যামল সরল রূপের কোমল মহিমা। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করের রুক্ষতা ও বলিষ্ঠতা থেকে মনোজ বসু ছিলেন অনেক দূরে। কিন্তু শৈলজানন্দ পল্লী ও প্রকৃতির থেকেছেন উদাসীন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনোজ বসুও পল্লীপ্রাণ এবং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তারাশঙ্কর জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং এর জন্য তিনি কিছুদিন জেলও খাটেন। তিনি একবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্য হন। তেমনি মনোজ বসুও ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, মিছিলে ঘোরা ও ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি — 'ভুলি নাই', 'সৈনিক', 'বাঁশের কেল্লা', 'আগষ্ট ১৯৪২' প্রভৃতি। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'(১৯৩৯), 'পাষাণপুরী' (১৯৩৩) 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯২৪) উপন্যাসে রাজনৈতিক চরিত্র ও বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে যা তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল বলা চলে। অন্যদিকে রাজনৈতিক বক্তব্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহ ছিল না। তাঁর বিচরণ ক্ষেত্রটাই ছিল ভিন্নতর।

> "উপন্যাসক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ ছিলেন একক যাত্রী। নিজস্ব প্রতিষ্ঠানভূমিতে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল দৃঢ় ও অবিচল, তাই কোনো যুগবিক্ষোভ ও সাময়িক চাঞ্চল্যে তিনি উত্তেজিত হয়নি।"[৫]

রাজনীতি থেকে শৈলজানন্দ বিভূতিভূষণের মত দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন।

শরৎ পরবর্তী যুগে তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে নব প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি সাহিত্যের ভাষায় মিলিয়ে দিয়েছেন মানুষের ঘাম ও রক্ত। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কার ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের চিত্র তিনি মহাকবির মতোই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম ও গ্রাম্য কবিয়ালদের কথাও এসেছে রচনায়। তবে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে দেশের মানুষের রিক্ততার যে রূপটি ধরা পড়েছে তা মনোজ বসুর শিল্প কর্মে গৃহীত হয়নি। তিনি গ্রহণ করেছেন পল্লী ও বাদা অঞ্চলে অখ্যাত জীবন সমাজ ও উদ্বাস্তু জনজীবনের গভীর যন্ত্রণার রূপটি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন—

> " 'কল্লোল' যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইট-কাঠ-লোহা-লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ বসু তাই খুঁজে পেয়েছে বনে বাদায় খালে বিলে, পতিতে আবাদে।"[৬]

এই নিয়ে লেখা মনোজ বসুর উপন্যাসগুলি হল – 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', প্রভৃতি। আর বিভূতিভূষণ তুলে ধরলেন ভাগলপুর ও শান্ত ইচ্ছামতীর তীরবর্তী মানুষদের কথা।

> "প্রকৃতি আর গ্রামের মানুষের মধ্যেই তিনি জীবনদেবতাকে দেখতে পান, কৃত্রিম প্লট সাজাতে কিংবা প্যাঁচ করতে পারেন না। বিভূতিভূষণ সত্য ও সুন্দরের সাধক।"[৭]

যার সার্থক প্রকাশ 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২) প্রভৃতি উপন্যাস। অন্যদিকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা ও রাণীগঞ্জের কয়লা শ্রমিক ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন 'কয়লা কুঠির দেশ' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'ঝোড়ো হাওয়া' (১৯২৩), 'বাংলার মেয়ে' (১৯২৫) প্রভৃতি উপন্যাস। তিনি কয়লাখনির অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী জীবনযাত্রা রূপায়িত করে বাংলা উপন্যাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। শৈলজানন্দ সম্পর্কে প্রবোধকুমার সান্যালের উক্তি –

> "শৈলজানন্দ নিয়ে এলেন রানীগঞ্জে কয়লা খনির ভিতর থেকে কাঁচা হিরের টুকরো। খনির কয়লাকাটা মজুর ও কুলি কামিনের সেই হাঁসি অশ্রু মেশানো গল্প পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করে দিল। মজুর সম্প্রদায়ের বিচিত্র ব্যক্তিগত এবং ঘরোয়া ছবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রথম সাহিত্যে আনলেন শৈলজানন্দ এবং সেই প্রথম তপশীলি ও উপজাতি সমাজের দুঃখ-দুর্দশা এবং আদিবাসী খনি মজুরদের জীবনযাত্রার সংবাদ কথাসাহিত্যে এসে হাজির হল। শৈলনাজন্দ ছিলেন তার পথিকৃৎ।"[৮]

কথাসাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও দেশবিভাগের মত ভয়ংকর ঘটনাকে লেখনীতে মহাকাব্যিক রূপ দান করতে পারতেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকেরা। তা করলেন না। তাঁরা দেশবিভাগের ঘটনাকে স্পর্শ করলেন মাত্র। তারাশঙ্কর তাঁর 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ সম্পর্কে প্রচ্ছন্নভাবে বলেছেন –

> "ধর্ম বিশ্বাস ঈশ্বর ইজ্জত এই কয়েকটার সমষ্টি একটা কিন্তু উদরের জ্বালার সঙ্গে এক হলেই বিস্ফোরণ ঘটে।... একটা জাত বা একটা দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে প্রচুর আহার্য আর সুখসম্পদের আফিং দিয়েও তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। আবার শুধু স্বাধীনতা দিয়ে নিরন্তর দুর্ভিক্ষ এবং অনন্ত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাকে শান্ত রাখা যায় না। তারা তাতেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, চিৎকার করে। দুটোর রিক্ততার সমষ্টি একসঙ্গে হলে তো কথাই নেই।"[৯]

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগের চরম অভিঘাতে বাস্তবের নিদারুণ বিপর্যয় তাঁদের তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। সমসাময়িক লেখক মনোজ বসু এই বিষয়ে চুপ থাকতে

পারেননি। তিনি দেশভাগের মত ঘটনাকে কেন্দ্রকরে লিখলেন - 'রক্তের বদলে রক্ত' , 'পথ কে রুখবে ?', 'মানুষ নামক জন্তু', 'মৃত্যুর চোখে আগুন' প্রভৃতি উপন্যাস। তবে পরবর্তী সময়েও এই বিষয়ে অনেক সাহিত্যচর্চা হয়েছে। যেমন – সমরেশ বসুর 'সন্তদাগর' (১৯৫৫), 'খণ্ডিতা' (১৯৮৭), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'উজান' (১৯৭১), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' (১৯৯৬) উল্লেখযোগ্য।

গান্ধীজি ও গান্ধীবাদের সমর্থনে বাংলা সাহিত্য বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের নরু চরিত্রটি গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও উপবাস কর্মসূচীর প্রভাবে রচিত। 'ধাত্রীদেবতা'র নায়ক শিবনাথ, 'পঞ্চগ্রামে'র দেবু গান্ধীজির মতাদর্শে সৃষ্ট চরিত্র। এছাড়া 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসের ধীরানন্দ শুধু কংগ্রেস মেম্বারই নয়, সে গান্ধীবাদী। মনোজ বসু তাঁর 'সৈনিক' উপন্যাসে গান্ধীজি প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য বিবৃত করেছেন। 'আগস্ট ১৯৪২' উপন্যাসে গান্ধীবাদী মহীনের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পাই। এছাড়া 'বাঁশের কেল্লা' উপন্যাসটিতেও গান্ধীবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের মত মনোজ বসুর 'নূতন প্রভাত' নাটকে গান্ধীবাদ অনুশ্রিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'পৌষ-লক্ষ্মী', 'শেষকথা', 'শবরী'র মত মনোজ বসুর 'সীমান্ত', 'আধুনিকা', 'স্মৃতিকথা' প্রভৃতি ছোটগল্পে গান্ধীবাদ স্থান পেয়েছে। সেই সূত্রে বিভূতিভূষণ কিংবা শৈলজানন্দের উপন্যাসে গান্ধীবাদ প্রায় নেই। বিভূতিভূষণের 'কালচিতি' গল্পে গান্ধীবাদ রয়েছে। গান্ধীবাদের বিরোধীতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট'। মনোজ বসু তাঁর 'কুম্ভকর্ণ' নামক ছোটগল্পে গান্ধীবাদের বিরোধীতা করেছেন।

দেশের প্রাণশক্তি ও কেন্দ্রস্থলের আধার জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি সমসাময়িক লেখকদের মত মনোজ বসুরও কৌতুহল-বোধে উদ্দীপ্ত। তারাশঙ্কর তাঁর 'জলসাঘর' (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) গল্পে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্ব, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। 'কালিন্দী' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে বীরভূমের গ্রামীণ জীবন এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ প্রাধান্য পেয়েছে। তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ ও বিরোধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবি এঁকেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের ট্রাজেডি মনোজ বসুকে আকর্ষণ করেনি। তিনি দেখেননি তারাশঙ্কর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (ঠাকুরদা, যোগাযোগ) মত সামন্ততন্ত্রের অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মির নিষ্প্রভ পান্ডুবর্ণ। নতুন সূর্যের

আলোয় দীপ্ত জীবনরস বাস্তবের মরণশীল জীবনবেদনাকে উপেক্ষার মাধ্যমে এক বিচিত্র ভাবলোক সৃষ্টি করেছে। যার অন্যতম প্রকাশ 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' (উপন্যাস) এবং 'নরবাঁধ' নামক গল্পে। তবে 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসে শিবনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ এবং 'নরবাঁধ' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় সিংহ চরিত্র অঙ্কনে মনোজ বসু যেমন তারাশঙ্করের আত্মীয় তেমনি 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত', 'আমার ফাঁসি হল' এর লেখক মনোজ বসু বিভূতিভূষণের আত্মীয়।

'বন কেটে বসত' উপন্যাসে জগন্নাথের দল আস্থা রাখতে পারে না গগনের উপর। জগন্নাথ বুঝেছে তার দল আর গগনের দল আলাদা। যে বাদা তাদের নিজের হাতে তৈরী সেই বাদার লোকালয়ের বাইরে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির পরিবেশে নতুন নীড় রচনার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায় তারা। লোভ ও বন্ধনের অধীন নয় বলেই তারা পাড়ি দেয় দরিয়ার কিনারে —

> "বনের বাঘ মানষেলায় যায় না, মানুষ বাঘও তেমনি সহজে আসতে চায় না এই দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেইজন্যে বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে বসত বানায়। পুরোপুরি বানানো হয়ে গেলে তারপরে দলকে দল বড়দরের মানুষরা এসে পড়ল। ভালো ভাল দালান-কোঠা হয়। ভারী ভারী মহাজনী নৌকো — এবং ক্রমশঃ ধোঁয়াকল-স্টিমার দেখা দেয় জলে। ঝনঝন টাকাপয়সা বাজে। ভাল রাস্তাঘাট হয় জুতো-পায়ে বাবুদের চলাচলের জন্যে। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। হেজেমজে মরে কতক। গগন দাসের মত এককালের দুঃখ সুখের সাথী কতজনে ভিড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। আর যারা নিতান্তই জগাদের মতন, নতুন জায়গার তল্লাসে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।"[১০]

কিন্তু পারবে কি নতুন বাদার দখল রাখতে? আবারও পাড়ি জমাবে অজানা উদ্দেশ্যে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসেও একই ছবি তুলে ধরেছেন। যাযাবর সাঁওতালদের অকৃপণ শ্রমে কালিন্দীর চর হয় স্বর্ণপ্রসবিনী। চরটির দখল নিতে শুরু হয় জমিদার শ্রেনীর লড়াই। চরের দখল নিয়ে যন্ত্রকলের মালিকেরা সাঁওতালদের পরিণত করে শ্রমদাসে। কেউ কেউ মালিকের সঙ্গে থেকে শ্রমদাসরূপে কাজ করে। কেউ কেউ পাড়ি জমায় অজানা ঠিকানায় 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের জগাদের মত। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালিন্দী' উপন্যাসের সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন —

> "যাযাবর সাঁওতাল সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহশীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে — চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে।"[১১]

'দেবযান' (১৯৪৪) নিয়ে লেখা জন্মান্তরবাদকে উপন্যাসের অতিপ্রাকৃতের তাত্ত্বিকতাকে মনোজ বসু ত্যাগ করেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন মর্ত্যমমতা ও মানবপ্রীতির উপর। বিভূতিভূষণের 'দেবযান' এর মত মনোজ বসুও তাঁর 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসে পার্থিব প্রেম ও স্নেহ ভালবাসার প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ অনুভব করেছেন। প্রেতলোকের মানব প্রেমতৃষ্ণা বিভূতিভূষণ ও মনোজ বসুর করুরই কম নয় বলে আমার ধারণা। শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর অতি প্রাকৃত রচনায় আগ্রহ দেখাননি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নায়িকারা প্রেমবঞ্চিতা, সমাজের বাধা, সংস্কারের বাধা, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বাধায় তাদের হৃদয়ে রক্তস্নাত। শরৎচন্দ্র যেন বেদনার্ত প্রেমের রূপকার। বিভূতিভূষণ সে পথে চালিত না হয়ে 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১) নামক উপন্যাসে কল্যাণকামনার পথে নারীপ্রেমের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু মনোজ বসু রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস রচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন। 'এক বিহঙ্গী', 'বকুল', 'রাজকন্যার স্বয়ম্বর', 'প্রেমিক' প্রভৃতি উপন্যাসে রোমান্সধর্মী মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করি। মনোজ বসুর নায়ক-নায়িকারা সামাজিক সংস্কার ও সংঘাতের বাইরে প্রেমের মুক্ত রূপে প্রকাশ পায়। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খায় দুটি উন্মুখ প্রাণ ছোটে প্রেমের বেদিতে আত্মদান করতে। তারাশঙ্কর কিংবা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর রচনায় নায়িকাদের প্রেম ও রোমান্টিকতা চোখে পড়ে না বললেই চলে। মনোজ বসুর মতো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'প্রচ্ছদপট' (১৯৩৪) উপন্যাসে শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ, প্রেম ও বিবাহে পরিণতির কাব্যোচ্ছ্বাসময় বিবরণ দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরবিশ্বাস বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাঁড়ুয্যের ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রকৃতিমুগ্ধতার উৎস স্বয়ং লেখক।

> "ভবানী বাড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন্ মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই কাকলিপূর্ণ অপরাহ্নে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে ঊর্ধ্বে অর্ধে, দক্ষিণ উত্তরে, পশ্চিমে পূর্বে।"[১২]

এই মর্তমমতা বিশ্বাসের জগৎ বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব। তারাশঙ্করের আধ্যাত্মব্যাকুলতা, ঈশ্বরজিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে 'সপ্তপদী' (১৯৫৩) উপন্যাসে। নায়ক কৃষ্ণেন্দু ভেবেছে —

> ঈশ্বর কি প্রেমহীন, প্রীতিহীন, স্নেহহীন ? সে কি বিদ্বেষপরায়ণ ? সে কি আঘাত করে।''[১৩]

বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের চিন্তায় ঈশ্বর জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেলেও মনোজ বসু এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ঈশ্বর বিশ্বাস সেভাবে ছায়া ফেলতে পারেনি। বরং মনোজ বসুর রচনায় বনবিবি, মন্ত্র, তুকতাক অনেক স্থানে জায়গা পেয়েছে।

সাঁওতালদের অকৃপণ চেষ্টায় গড়ে উঠেছে কালিন্দীর চর। প্রাক ধনতান্ত্রিক যুগের প্রতিভু যন্ত্রকলের মালিক অর্থশক্তিতে করায়ত্ব করে নিলেন সাঁওতালি সম্প্রদায়কে। কালিন্দীর চরে স্থাপিত হল নতুন যুগের যন্ত্রকল। কৃষিজীবী সাঁওতালরা পরিণত হলেন শ্রমদাসে। তারাশঙ্করের কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাসের মতই 'চাঁদের ওপিঠ' উপন্যাসে মনোজ বসু দেখিয়েছেন কলের আগমনে শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হয়েছেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ ও বাস্তুহারাদের কথা যেভাবে মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন তা এককথায় অনন্য। বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব এনে দিয়েছেন পৃথক এক সাহিত্যজগত গড়ে তুলতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. কালের প্রতিমা – অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ৭৫

২. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - সম্পাদক-হাসেম আলি ফকির, মার্চ ২০০৫, পৃ. ৭

৩. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৭৭৫

৪. ধ্বনি - ২৪শৈ আগষ্ট, ১৯৬৮, পৃ. ১২৭১

৫. কালের প্রতিমা - পূর্বোক্ত , পৃ. ৫৪

৬. কল্লোল যুগ - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম.সি.সরকার, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ২৩৮

৭. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪২

৮. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৯

৯. অরণ্যবহ্নি - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ. ৪২৮

১০. বন কেটে বসত – মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ. ২৪০

১১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৫৫৩

১২. কালের প্রতিমা - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১৩. কালের প্রতিমা – পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭